বর্তমান প্রজন্ম জানেনা আমাদের হাপু গানের কথা

লোক সংস্কৃতির একটা প্রধান অঙ্গ লোকসাহিত্য। লোককাহিনী, লোকসংগীত, ভাওয়াইয়া, বিয়ের গীত, পালাগান, ছড়া, ধাঁধা ও প্রবাদ প্রবচন লোক সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এগুলো মূলত অলিখিত সাহিত্য। পাড়াগায়ের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত নরনারীর রস পিপাসা মিটানোর তাগিদেই এর সৃষ্টি। এগুলো মানুষের মুখে মুখে সৃষ্টি হয়েছে, মুখে মুখেই চলে এসেছে। এর রচয়িতারা চিরদিন লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে। আধুনিককালে এগুলোকে বইয়ের পাতায় বন্দি করা হলেও বহুকাল ধরে তা গ্রামের পথে ঘাটে নরনারীর মুখে মুখে বিচরণ করছে। মেহেরপুরের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত লোক কাহিনীগুলো মূলত সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য সৃষ্টি। এগুলোতে তত্ত্ব কথা বা শিক্ষনীয় কিছু নেই। বরং স্থূল হাস্যরসসহ আদিরস বিদ্যমান। বেশিরভাগ কাহিনী বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন। রাজা-রানী, জ্বিন-ভূত, রাক্ষস-খোক্ষস, সিংহ-বকরী, বোকা-পাগল, এই ধরনের অতি পরিচিত কাহিনীগুলোই লোক সাহিত্যর ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। এমনই একটি লোকসাহিত্য হাপু গান। বর্তমান প্রজন্ম জানেন না বা শোনেননি হাপুগানের কথা।

মেহেরপুরের কুতুবপুর ইউনিয়নের বরকত আলী গ্রামে গ্রামে ‘হাপু গাবো পয়সা পাবো’ গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো। বয়সের ভারে আর হাপু গেতে না পেরে ভিক্ষেবৃত্তিই তার জীবনজীবিকা। বর্তমানে মেহেরপুরের কোন গ্রামের কেউ আর হাপুগেয়ে জীবিকা নির্বাহ করেনা। বিভিন্ন অঞ্চলে এই হাপু গান বিভিন্ন নামে পরিচিত। অঞ্চলভেদে এটি ‘হাপু’, ‘হাবু’ অথবা ‘হাফু’ নামে পরিচিত। তবে সর্বজনীনভাবে ‘হাপু’ নামটিই যথার্থ। ‘হা’ শব্দের অর্থ হা-অন্ন, বা হাহাকার এবং ‘পু’ শব্দের অর্থ পূরণ। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদচূত্য মানুষ গান গেয়ে তাঁরা নিজেদের হাহাকার বা কষ্ট পূরণ করত, অর্থাৎ হৃতসর্বস্বের হাহাকারই এই হাপু গান।

সাধারণত দুইজন লোক একসঙ্গে এই গান গেয়ে থাকে। একজনের হাতে মদিরা বা গোপীযন্ত্র থাকে, আর একজনের হাতে ছোট একখানি লাঠি। লাঠিধারী লোকটি গান গায় এবং তার সঙ্গী লোকটি ধুয়া ধরে। মুখে শব্দ-সহ পিঠে লাঠির আঘাত করে ওই গান গাওয়ার রীতি। ধুয়া গাবার পদ্ধতিটি একটু অদ্ভুত। এক পদ করে গান গায়, আর মুখে একপ্রকার শব্দ করে

নিজের পিঠেই লাঠি দিয়ে তাল ভাজে। অবিশ্রাম লাঠি চালনার ফলে অনেকের পিঠে কালশিরা দাগ পড়ে যায়। কতকটা নমস্কারের ভঙ্গিতে লাঠিটা হাত দিয়ে ধরে থাকে। হাপু গানের মধ্যে সমাজ জীবনের ছবি তুলে ধরে। একই সঙ্গে গ্রামবাংলার অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিকাঠামোর একটি প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়। ওই লোকগান বর্তমানে বিলুপ্তির পথে।

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গ’ নামক বইয়ে বলা হয়েছে- বেদে/হাপু গানের নানান উদাহরণ পাওয়া যাবে। এই গানে তাল রাখতে ঘুঙুর, খঞ্জনি আর ডাবকি ব্যবহৃত হত। দ্রুত উচ্চারনের জন্য (যাকে আজকের ভাষায় র্যাপ বলে) গানের আগে মুখে এক ধরনের শ্বাস নেওয়ার ধরণটাই হাপু গানের নিজস্ব ধারা। মহিলা আর ছোটছোট ছেলেমেয়েরা বগল বাজিয়ে, হাত দিয়ে শরীরের নানান অঙ্গে আঘাত করে বিচিত্র শব্দ তুলে, নানান অঙ্গভঙ্গীকরে গান পরিবেশন করেন ।

চিরকালের মতই মধ্যবিত্ত বিশেষজ্ঞরা হাপুকে মোটাদাগের, অশ্লীল বা অশ্রাব্যসহ নানান ধরণের উচ্চসাংস্কৃতিক অভিধা দিয়েছেন। তবুও বলা যায় হাপুর তুলনা হাপুই। তথাকথিত অশিক্ষিত-অমার্জিত জনগণই দেশের সংস্কৃতির হকদার, রক্ষাকর্তা। যে সব মানুষ এধরনের সংস্কৃতিকে মোটাদাগের, অশ্লীল বা অশ্রাব্যবলে গালি পাড়ে, তারাই নিজের দেশের সম্পদের প্রতি অশ্রদ্ধাজ্ঞাপণ করছেন। মুখে এক অদ্ভুত রকম আওয়াজ করে, একটা লাঠির বাড়ি পিঠে মারতে মারতে গাওয়া গানই আমাদের হাপু গান। কয়েকটা হাপুগানের নমুনা

ক) জামাই এলো কামাই করে খেতে দিব কী?
হাত বাড়িয়ে দাও গামছা মুড়কি দি।
উড়কি ধানের মুড়কি দেব পাতে জল খেতে।
জ্যোষ্টি মাসে ছাতা দেব রোদে পথে যেত।
খ)হাপু রে হাপু
হাপু গেল মাঠে,
হাঁকে বাজার গেল।
আঁকুর গাছে পাকুর পাতা
রোদে ঝিলমিল করে গো,
বাবুদের আছে জোড়াকল
সে কলে পানি পাবো গো।
হাটে গেলাম বাজারে গেলাম
কিনে আনলাম আদা,
আদা খেয়ে হাঁদুর বাবা হাগে গাদা গাদা । গ) কটাতে কোটিতে ঝগড়া লেগেছে

কোটি কটাকে খুব মেরেছে,
এই শুনে কোটি আত্মহত্যা করেছে।
হাপু আতা পাতা লো,
হাপু সর্ষে পাতা লো,
হাপু আম খাবি জাম খাবি,
তেঁতুল খাবি লো,
তেঁতুল খেলে প্যাট গুলোবে ছেলে হবে না, হাপু কাকে খেলে লো,
হাপু ক্যা ঝাড়নি লো,
হাপু বেদের মাকে লো
ই ডাঙাড়ে ঐ ডাঙাড়ে শালিক বস্যেছেঁ বেদের মাকে বিয়া করতে পাল্কী আস্যেছেঁ ঘ)বুড়াতে বুড়িতে লড়াই লাগ্যেঁছে
বুড়া কপালে বুড়ি পাদ্যেঁ দিয়েঁছে
হা ফুঃ কদম ফুঃ
ঙ) হাই লো বামুন দিদি
বাগদি ঠাকুরঝি
আমি কেলে গয়লার বেটার
ঠিয়ে কখন হাঁস্যেছি-
হাঁস্যেছি বেশ করেছি তর বাপের কী
যখন ছিলাম ছ‘বছরের
তখন উঠে নাই গা
এখন আমি বছর তেরো
হব ছেলের মা
মাছ ধরতে গিলাম আমি
কুঁয়ে লুদির কুলে
দেখি এ্যাক মিনসে
রসির লাগর
ডাঁড়া ফেলছে চারে
জলে নেমে জাল ছাঁকি
আর মিনসে থাকে চেঁয়ে
ভাল কেনা তুই ঢ্যামনা মিনসে থানা কেনা চেয়ে
তাকে দেখে উচএ যাব
নইক তেমন মেয়ে
মাছ ধরছি চিংড়ি চাঁদা

গচি মাগুর গাগর
কার্তিক মাসে মাছের রসে
বলবো কি বুন বলবো কিলো
আমার প্যাট হয়েঁছে ডাগর
খোসার দুম খোলাক দুম
কাঁথা চাপা দিঁয়ে মারব ঘুম।

একটা সময় হাপু গান গাইতেন বেদে, মালসহ ভ্রাম্যমান জীবন যাপন করা সম্প্রদায়। মেহেরপুরের আমঝুপি গ্রামের রফিকুল ইসলামের কাছে শুনেছিলাম হাপুর এই বাণি। এঁদের গানে আরও চমৎকৃত হওয়ার উপাদান রয়েছে।

এই গান কিছু গবেষকদের মতে বেদনা, দুঃখ ও হাহাকারের গান। কিন্তু কিছু গবেষকদের মতে হাবু গান মানুষের প্রতিবাদের গান। কারণ এর মধ্যে দুঃখ-বেদনার কথা থাকলেও, তার প্রতিবাদও আছে। সামাজিক সম্মান লাভ থেকে যারা বঞ্চিত , সেই সকল মানুষের এগুলো প্রতিবাদী গান। তাদের দুঃখ, কষ্ট, হাহাকার এইগুলি পূরণ করাই হল এই গানের মূল উপজীব্য। হাপু যে গায় সে নিজের পিঠে লাথি দিয়ে তাল ভাঁজে। অবিরাম পিঠে লাথি চালানোর ফলে পিঠে অনেক দাগ পড়ে যায়। কখনো কখনো কেটে যায়, কিন্তু সেই দুঃখ-কষ্ট তারা পরোয়া করে না। তারা মনে করে তাদের এই দুঃখ-কষ্ট সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের তুলনায় নগণ্য। হাবু গানের মধ্যে আছে সমাজ জীবনের বিভিন্ন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক জীবনের ছবি। সেগুলো দেখার-বোঝার দৃষ্টিশক্তি, বোধবুদ্ধি আমরা হারিয়ে ফেলছি।

লেখক: সাংবাদিক ও একাধিক বইয়ের লেখক।

বাঙালিসংস্কৃতি ধর্মবিরোধী নয়, বরং ধর্মসহিষ্ণু

চিন্তানায়ক অন্নদাশঙ্কর রায় তার ‘সাংস্কৃতিক বিবর্তন’ গ্রন্থেলিখেছেন,বিশ শতকের মাঝামাঝি ইন্দোনেশিয়া থেকে এক মুসলমান অধ্যাপক শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন সংস্কৃত ছন্দের ওপর বক্তৃতা

করতে। অধ্যাপক সাহেবের নাম ছিল বীর্যসুপার্থ। বীর্য মানে বীর আর সুপার্থ মানে পার্থ, অর্থাৎ অর্জুন।একজন মুসলমানের নাম কী কখনও মহাভারতের কোনো বীরের নামে হয়! কোনো মুসলমানের নাম কী পার্থ, শান্তনু কিংবা অভিমন্যু হতে পারে? হ্যাঁ পারে, অবশ্যই হতে পারে। একজন মুসলমানের নাম যদি অগ্নি-উপাসক সোহরাব-রুস্তুম-লায়লার নামে হতে পারে, তাহলে রামায়ণ-মহাভারতের বীরদের নামে নয় কেন? মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ ইন্দেনেশিয়ার সর্বমহলেভারতবর্ষের রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য হিসেবে পঠিত হয়, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভিয়েতনাম ও কম্পুচিয়াতেও পঠিত হয়। ভারতীয় রামায়ণ কিংবা মহাভারত ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও, গ্রন্থ দুটি তারা পরিত্যাগ করেনি।ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপের অধিবাসীরাঅধিকাংশই ধর্মে মুসলমান, তারপরও তারা ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আধুনিক ইন্দোনেশিয়ার স্থপতির নাম আহমদ সুকর্ণ এবং তার কন্যার নাম মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী।

তাদের বিমানবন্দরের নাম গারুদা বা গরুড়,গরুড় হল বিষ্ণুর বাহন। ইন্দোনেশিয়ার এক পণ্ডিতের নাম আবদুল্লাহ সরস্বতী। তারা ধর্মে মুসলমান, কিন্তু ভারতীয় পুরাণের অনুগামী। যেমন আরবরা ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু প্রাক-ইসলামি যুগের অনেক আচার ত্যাগ করেনি। তাদের প্রিয় কবি ইমরুল কায়েসকেও ত্যাগ করেননি।

বিশ্বের সব সভ্য জাতিই নিজ সত্তারশেকড় খুঁজে পেতে তার ঐতিহ্যর দ্বারস্থ হয় এবং খুব দরদ দিয়েই পূর্বপুরুষদের কৃতী-কীর্তির প্রতি আবেগ ও সহমর্মিতা প্রকাশ করে। ইংরেজরা আপস-সমঝোতা ও সংগ্রামের পথ ধরে আধুনিকতা, মানবিকতা ও গণতন্ত্র গ্রহণ করেছে,শক্তিশালী ও পরিপুষ্ট করেছেবিজ্ঞানচর্চা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে,কিন্তু রাজতন্ত্রের জৌলুশ-জাঁকজমক, লোকাচার ও অভিজাততন্ত্রের কৌলিন্য ত্যাগ করেনি। তারা অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগকেও নিয়েছে, গ্রিক-রোমান ঐতিহ্যকেও ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি। শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুষ ধ্যানেজ্ঞানে যেমন আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক হয়, তেমনই ঐতিহ্যের কাছেও নতজানু হয়। পূর্বপুরুষদের সৃজনকলারপ্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কুণ্ঠিত হয় না। এজন্যই একজনশিক্ষিত জাভানিজ পিতা তারআদরের পুত্রের নাম রাখেন বীর্যসুপার্থ।

সাংস্কৃতিক কারণেই কাশ্মিরী কায়স্থ ব্রাহ্মণ মোতিলাল নেহেরু তার পুত্রের নাম রেখেছিলেন সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে পারসি ভাষায় জওয়াহেরলাল নেহেরু। একই কারণে উত্তর ভারতের কায়স্থহিন্দু খোশবখত রায়ের পুত্রের নাম হয় ইকবাল বখত রায়। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি

মমতার কারণেই একজন ভারতীয় পার্সি তার পুত্রের নাম রাখেন জাহাঙ্গীর রতনজি দাদাভাই টাটা। মনেপ্রাণে কট্টর মুসলমান হয়েও ইরানিরা ‘নওরোজ’ উৎসব উদযাপন করেনজাঁকজমক সহকারে।নওরোজ কোনো ধর্মীয় উৎসব নয়, আবার ধর্মবিরোধীও নয়। এটা একটি ঋতুভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক উৎসব। ঐতিহ্যপ্রীতির কারণে কয়েক শোবছর আগে ইসলামে দীক্ষিত হয়েও আমরা বর্ষবরণ,পৌষ-পার্বণ ও নবান্ন উৎসব উদযাপন করি।ভারতচন্দ্রের মঙ্গলকাব্য পাঠ করে আনন্দিত হই। চৈতন্যচরিতামৃত কিংবা বৈষ্ণব পদাবলী বুকের ভেতরে শিহরণ জাগায়। লালন-গগন হরকরার গান শুনে ‘মনের মানুষ’কে খোঁজার চেষ্টা করি। তাদের গানের ভিতর দিয়েই খুঁজে পাই আমাদেরআত্মপরিচয়ের ঠিকানা। তাদের প্রতিভার উজ্জ্বলতা আর ভাষা দিয়েই প্রকাশ করি আমাদের অধ্যাত্মচেতনা, দ্রোহ, প্রেম ও মানবিক আবেগ-সংরাগ। আমরা গর্ব অনুভব করি এই ভেবে যে, লালন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বাঙালি ছিলেন।তারা বাংলা ভাষায় কথা বলেছেন, সাহিত্যচর্চা করেছেন এবং এ ভাষার জন্য লড়াই করে গেছেন। চর্যাপদের সিদ্ধাচার্য ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের পদকর্তারাও বাঙালি ছিলেন। তাদের ধর্মপরিচয় কিংবা বংশলতিকা নিয়ে কী আমরা তেমন মাথা ঘামাই? না, একদম না। যে-ধর্মের অনুসারীই হোন না কেন, তারাই আমাদের পূর্বপুরুষ। আামাদের যত গর্ব ও গৌরব, যত কৃতী ও কীর্তিসবই তো তাদের নিয়ে! তারাই আমাদের শিখিয়েছেন, মানুষ অমৃতের সন্তান। বলেছেন: ‘সহজ মানুষ ভজে দেখনারে মন দিব্যজ্ঞানে।’ মানুষ ভজনার বার্তাটি তো লালন ও তার সহগামীদের মাধ্যমেই এ ভূখণ্ডে জারি আছে।

কোনো সাম্প্রদায়িক হীনমন্যতা বা হুজুগ লালনকে ইতিহাসের সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। তিনি বলেছেন, বংশ জাতপাত, আভিজাত্য, কৌলিন্যের ভিতর মানুষের পরিচয় নেই। মানুষের পরিচয় তার কর্মে, তার কীর্তিতে।মানুষকে কীর্তিমান হতে হলে, তাকে অবশ্যই ইতিহাস, দেশকাল ও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। এজন্যই লালন বাঙালিত্বের কাছে, ইতিহাসের কাছে, বাংলার ভাবুকতার চরণতলে নতজানু হয়ে বলেছেন: ‘ভাব জানি নে, প্রেম জানি নে/ দাসী হতে চাই চরণে।’ আসলে মানুষ তার জন্মস্থানের দাগ মুছতে পারে না। বদলতেপারে না প্রাকৃতিক পরিচয় বা জাতি-পরিচয়ের দাগ। আমাদের পূর্বপুরুষরা হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে যদি ইসলাম গ্রহণ করে থাকেন, তাতে তাদের ধর্মগত পরিচয় কেবল পাল্টিয়েছে, জাতি-পরিচয় নয়। মানুষ তার ধর্ম পরিচয় বদলাতে পারে, জাতি-পরিচয় বদলাতে পারে না।একজন হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান বা খ্রিস্টান হতে পারেন কিংবা একজন শাক্ত খুব সহজেই বৈষ্ণব হতে পারেন, কিন্তু একজন চাকমা কিংবা

মারমা কোনোভাবেই বাঙালি হতে পারেন না।কেবলমাত্র জন্মসূত্রেই বাঙালি হওয়া যায়। এটা মানুষের দৈব-নির্ধারিত প্রাকৃতিক পরিচয়। বিধাতা প্রদত্ত পরিচয়। বাঙালিত্বের সঙ্গে কোনো ধর্মের-ই বিরোধ নেই।ইসলাম কিংবা হিন্দুধর্মকবাঙালিত্ব শত্রুজ্ঞান করে না। ইসলাম কিংবা হিন্দুধর্মের বিধিবিধান, আচার-আচরণ বাঙালিয়ানার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। তবে বাঙালিত্ব ও পাকিস্তানিত্বের মধ্যে সম্পর্কটা ছিল বেশ গোলমেলে। ২৩ বছরেও দুটো ভাবকল্প এক করা যায়নি, মেলানোও সম্ভব হয়নি। তাই পাকিস্তানিদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েই ১৯৭১ সালে বাঙালিত্বের পুনর্জন্ম হয়।স্বাধীন বাঙালি সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য আমরামুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম।

আজকাল একদল ধর্মোন্মাদ এবং কিছু জ্ঞানপাপী বাঙালিয়ানা,পয়লা বৈশাখের উৎসব ও মঙ্গল শোভাযাত্রাকে হিন্দুয়ানি আখ্যা দিয়ে হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছে।ইতিহাসের ধারা, দেশ ও সময়ের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে তারা আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে চায়। বাঙালি সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও বহুত্ববাদিতা অস্বীকার করে ওরা আমাদের এনিম্যাল ফার্মের জন্তু বানাতে চায়। খারিজ করতে চায় লালন ও অন্যান্য সাধকদের গান ও দর্শন। বাতিল করতে চায় রবীন্দ্রনাথ-নজরুলসহ জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত। গগন হরকরারসুরে রবীন্দ্রনাথের রচিত ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি’ গানটি জাতীয় সংগীত হিসেবে ওদের পছন্দ নয়। এদের কণ্ঠের সুর ও স্বরের সঙ্গেপাকিস্তানি জামানার সুবিধাবাদী সংস্কৃতিসেবী ও বুদ্ধিজীবীদের হাঁকডাকের বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। একদিনএরাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংহতির দোহাই পেড়ে উর্দু শিখিয়ে আমাদের ইমানদার-পাকিস্তানি এবংসহি মুসলমান বানাতে চেয়েছিলেন। এরা আসলে মতলববাজ। এদের লোলুপ দৃষ্টিমনসদের দিকে। ইসলামি তাহজিব-তমুদ্দুনের দোহাই পেড়েএরা ক্ষমতার ক্ষীর-প্রসাদের স্বাদ আস্বাদন করতে চায়। নজরুল ভাষায়, এরা আসলে ভণ্ড,‘জায়নামাজ দেখানো’ বকধার্মিক!লালন-রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতা, পয়লা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রাকে ইসলামবিরোধী কৃত্য আখ্যা দিয়ে এরা আসলে রাজনৈতিক মতলব হাসিল করতে চায়। এদের চোখে লালন ফকির কেবলই ‘ন্যাড়ার ফকির’ কিংবা মুশরেক, বেদাতি, বেনামাজি।

কিন্তু তার সৎ জীবনযাপন ও উচ্চমার্গীয় গান রচনার প্রতিভা যে আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে, এটা ওরা আমলেই আনতে চায় না। লালন যে-উচ্চস্তরের চেতনাসম্পন্ন সাধক-পুরুষ ছিলেন, এটা ওরা স্বীকার করে না। লালনযে সব ধরনের ভেদবুদ্ধি, শোষণ বঞ্চণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ছিলেন, এটা কী অস্বীকার করা যায়? লালন-

রবীন্দ্রবিরোধী, বাঙালি-সংস্কৃতিবিদ্বেষী গোষ্ঠীগুলোকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, কেন পহেলা বৈশাখ উদযাপনে, মঙ্গল শোভাযাত্রার জনসমারোহে শামিল হওয়া যাবে না? এই সব লোকায়ত উৎসবের সঙ্গে ধর্মের কী কোনো বিরোধ আছে?এসব উৎসব জনমনে জনসমাজে কী বিভ্রান্তি-বিভাজন সৃষ্টি করে? করে না। তাহলে কেন এতো বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়? আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি,এসব উৎসব ইসলামের মূল স্পিরিটের পরিপন্থী নয়, বরং সহগামী। বাঙালি সংস্কৃতি কখনই ধর্মবিরোধী নয়, বরং সব সর্বতোভাবে ধর্মসহিষ্ণু। বাঙালি সংস্কৃতি সর্বধর্মের সঙ্গে এক ধরনের যৌক্তিক ফায়সালা করেই চলে এবং চলতে চায়। এই সংস্কৃতির ভিতর নাস্তিকতা বা নিরীশ্বরবাদিতার উপাদান খুবই কম। আমাদের ভাবুক-মহাজনরা ধর্মের সারকথা জানতে-বুঝতে এবং জানাতে-বুঝাতে গিয়ে তর্ক করেছেন বটে, কিন্তু ধর্মের মানবিক দিকগুলি গ্রহণ করেছেন দ্বিধাহীন চিত্তে। ধর্মের সঙ্গে কোনোভাবেই বিরোধে লিপ্ত হননি। ধর্মের মর্মশাঁস গ্রহণ করেও সাম্প্রদায়িক ধর্মের গণ্ডির বাইরে দাঁড়িয়ে মুক্তির পথ খুঁজেছেন। আশ্রয় খুঁজেছেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের নিবিড় ছায়াতলে। এ কারণে লালন গাইতে পেরেছেন: ‘যে যা ভাবে সেই রূপে সে হয়।/ রাম রহিম করিম কালা এক আত্মা জগৎময়।।’যারা বাঙালি সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি-সাধকদের ধর্মবিরোধী বলতে চান, তারা আসলে আমদের সংস্কৃতির মূল ভাবটাই বুঝে উঠতে পারেননি অথবা জ্ঞানতই বুঝতে চান না।চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, লালন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল– এঁরা কেউই ধর্মবিরোধী ছিলেন না। নিরীশ্বরবাদীও নন।বরং ধর্ম, জাতপাতের নামে বিভাজন-বিভক্তিতে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। জাতবিচারীদের আচারেক্ষুব্ধ মর্মাহত লালন বলেছেন:
‘ফকিরি করবি ক্ষ্যাপা কোন রাগে।/ আছে হিন্দু মুসলমান দুইভাগে।/ থাকে ভেস্তের আশায় মমিনগণ/ হিন্দুরা দেয় স্বর্গেতে মন/ ভেস্তে-স্বর্গ ফাটক সমান/ কার-বা তাতে ভাল লাগে।’

ইদানিংএক শ্রেণির সুবিধাবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতিক, ধর্মবেত্তা ও শাস্ত্রকার বাঙালির পোশাক-আশাক, খাবার-দাবার, বিয়েশাদি বিষয়ক আচার-আচরণ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। বাঙালির সবকিছুতেই তারা হিন্দুয়ানির গন্ধ খুঁজে পান।উৎসব-অনুষ্ঠান, বিয়েশাদিতে বাঙালি রমণীরা শাড়ি পরিধান করুক, এটা তাদের পছন্দ নয়। শাড়ি পরিধান করা ওদের চোখে হিন্দুয়ানি। নতুন ধানের চালের পায়েস খেয়ে নবান্ন উৎসব করাওহিন্দুয়ানি। গায়ে হলুদ, বৌভাত, ঈদ উপলক্ষে শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক প্রকাশনা, কবিতা-রচনা, সুন্নতে খৎনার প্রীতিভোজ- এসবও নাকি হিন্দু-আচার! সব-ই যদি হিন্দুয়ানি আচার

হয়, তাহলে বাংলাদেশে ইসলামি আচার কোথায়!তাহলে অঙ্গুলিমেয় আলখেল্লাধারী ফতোয়বাজ ছাড়া বাংলাদেশের সব মুসলমানই কী বেশরা বেদাতি? ওদের সকীর্ণ মত মানলে,বাংলাদেশের দু জনপ্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকেও শুদ্ধ মুসলমান বলা যায় না। কারণ তারাও পয়লা বৈশাখ উদযাপন করেন। শাহজালালের দরগায় যান, শহীদ মিনার ও স্েমিৃসৗধে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। আরবরা চৌদ্দ শো বছর আগেপৌত্তলিকতা ছেড়েছে, কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠানে শাঁখ বাজানো- উলুধ্বনি দেয়া বন্ধ করেনি। তাহলে, আরবের মুসলমানরাও কী হিন্দু? এদেশে একদল মতলববাজ আছেন যারা বাংলা ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, বাঙালির লোকজ উৎসব,পোশাক-আশাক, রান্নাবান্না- সবকিছুতেই হিন্দুয়ানির গন্ধ খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু মাইকেল জ্যাকসন, ম্যাডোনা, পপ-রক, ব্যান্ড শুনলে ওদের ইমান-আকিদা নষ্ট হয় না। ইসলামি আকিদা নষ্ট হয় কেবল লালন, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত আর ডিএল রায়ের গান শুনলে। মির্জা গালিবের পদাবলি, হিন্দি-উর্দু গজল ওদের প্রতিপক্ষ নয়, ওদের প্রতিপক্ষ রামপ্রসাদী- পদাবলী কীর্তন এবং রবীন্দ্র-লালনের গান। কারণ এগুলি যে বাঙালির নিজস্ব সম্পদ! বাঙালির নিজস্ব ভাবসম্পদকে ওরা ভয় পায়, প্রতিপক্ষ মনে করে।রাজনীতির ময়দানে মাতব্বরি এবং খবরদারি করার জন্য ওরাবাঙালি সংস্কৃতির সবকিছুকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। লালনের গান ও একতারা, পয়লা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা ওদের ভীষণ প্রতিপক্ষ। কিন্তু এমন হীনমন্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কী কোনো জাতি সভ্যভব্য ও সম্ভ্রান্ত হতে পারে? নিজের দেশ ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষা-অবহেলা করে কী বড় হওয়া যায়? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, নিজ দেশ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে উদার-মানবিক-প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া কোনো জাতি মহান হতে না। শাদা কালোয়, ধর্মে-আচারে, বর্ণে-বর্ণাশ্রমে, যবন-কাফেরে, হিন্দু মুসলমানে বাংলাদেশ ও বাঙালি সমাজটা ভাগ হয়ে যাক, এটা কী কোনো ইতিহাসমনস্ক দেশলগ্ন মানুষের চাওয়া হতে পারে?
লেখক: লোকগবেষক ও প্রাবন্ধিক, সহযোগী অধ্যাপক, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর